ষষ্ঠ অধ্যায়

ওখানে যাওয়ার যাত্রা শুরু এখানে নয়

কণাপদার্থবিদ্যা ও বিগ ব্যাং কসমোলজির স্ট্যান্ডার্ড মডেল মানবীয় বুদ্ধির এক অনন্য বিজয়। এটা নিয়ে গর্বিত হতেই হবে। প্রথমটি মডেলটি অবিশ্বাস্যরকম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বস্তু ও বিকিরণের আচরণের ব্যাখ্যা দেয়। হিগস বোসনের আবিষ্কারের পর উচ্চশক্তির পদার্থবিদ্যার সব পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষামূলক ফলের ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে মডেলটি (বা অন্তত নিজের মধ্যে স্থান করে দিতে পেরেছে)। দ্বিতীয় মডেলটি বলে মহাবিশ্বের বড়-কাঠামো এ মডেল থেকে আমরা বেশ কিছু বড় প্রশ্নের উত্তর পাই।

ব্যাপারটা অবশ্যই খুশির খবর। তবে সে খুশিতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। এ তত্ত্বগুলো অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। ভৌত বিশ্বের গড়ে ওঠা সম্পর্কে বহু কিছু নিয়ে সম্পর্কে তত্ত্বগুলোর কোনো বক্তব্য নেই। বিজ্ঞানীরা পেতে চান এমন তত্ত্ব যা অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ওপর সামান্য পরিমাণ নির্ভরশীল হবে (বা আরও ভাল হয় একটুও নির্ভরশীল না হলে)। কণাপদার্থবিদ্যা ও বিগ ব্যাং কসমোলজির স্ট্যান্ডার্ড মডেল এ প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ করত্র পারে না। দুই তত্ত্বই দারুণভাবে সফল। তবুও এদের মধ্যে কিছু জিনিস আছে যা ঠিক সন্তোষজনক নয়।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব ভৌত বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু আরও অস্বস্তিকর কথাও বলে। এগুলোকে উপেক্ষা করে গেলেও কণাপদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ক্ষেত্র তত্ত্ব যা বলে না তাও মেনে নিতে হবে। মৌলিক বস্তু ও বলকণা এবং হিগস ক্ষেত্রের মধ্যে হওয়া মিথস্ক্রিয়ার শক্তি সম্পর্কে এ তত্ত্বগুলো কিছুই বলতে পারে না। ফলে এদেরকে দিয়ে 'প্রথম নীতি' কাজে লাগিয়ে কণার ভর বের করা সম্ভব নয়। আমাদেরকে বরং ভর বের করতে হয় পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে। এরপর সে মানগুলো সমীকরণে বসিয়ে দিতে হয়। একইভাবে বস্তুকণাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলগুলোর আপেক্ষিক শক্তি জানার নেই কোনো উপায়। করতে হয় পরিমাপ।

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সব কণার আছে প্রতিকণা#১। প্রতিকণার ভর প্রতিকণার ভরের সমান। তবে চার্জ বা আধান বিপরীত। যেমন ইলেকট্রন (e-) ও প্রতিইলেকট্রন বা পজিট্রন (e+)। কণা ও প্রতিকণার দেখা হলে দুটোই ধ্বংস হয়ে যায়। তৈরি হয় উচ্চশক্তির ফোটন। তবে আলাদা করে রাখা গেলে কণা ও প্রতিকণাকে পুরোপুরি স্থিতিশীল মনে হয়।

তবে দৃশ্যমান মহাবিশ্ব পুরোপুরি বস্তু দিয়ে তৈরি বলেই মনে হয়। বস্তু ও প্রতিবস্তুর (antimatter) মিশ্রণ নয়। যুক্তি বলে, বিগ ব্যাংয়ের পরের মুহূর্তগুলোতে বস্তু ও প্রতিবস্তু সমান পরিমাণে তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু তাহলে সব বস্তু ও প্রতিবস্তু কেন একে অপরকে বিনাশ করে দেয়নি। তাই হয়ে থাকলে মহাবিশ্ব থাকত আলোয় ভরপুর। থাকত না কোনো পদার্থ। দেখে মনে হয়, দৈব কারণে অথবা কোনো প্রয়োজনের কারণে দুই ধরনের বস্তুর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুকণারা সংখ্যাধিক্য লাভ করে। বর্তমানে স্বীকৃত কোনো তত্ত্বই এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

তারপর আছে ডার্ক ম্যাটারের রহস্য। বিগ ব্যাং কসমোলজির এক অপরিহার্য অংশ। কিন্তু কণাপদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেলে পুরোপুরি অনুপস্থিত। আছে বহু অনুমাননির্ভর কথা। পরীক্ষামূলক অনেকগুলো গবেষণা এগোচ্ছে। তবে বর্তমানে এর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না বলেই মনে হচ্ছে। বস্তু ও বিকিরণের ওপর শনাক্তকৃত প্রভাব থেকেই শুধু বর্তমানে আমরা এর উপস্থিতির কথা জানতে পারি। ফলে আমরা নিশ্চিত করে বলতেও পারি না, ডার্ক ম্যাটার আছেই।

শূন্যস্থানের শক্তি ডার্ক এনার্জি অবস্থা কোনোভাবেই এর চেয়ে ভাল নয়। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও খারাপ। স্ট্যান্ডার্ড বিগ মডেল থেকে নেওয়া মহাজাগতিক ধ্রুবকের বর্তমান মান থেকে মনে হচ্ছে ভ্যাকুয়াম এনার্জির ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এক জুলের ১০ লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। শক্তির একক হিসেবে জুল হয়ত আপনার কাছে অচেনা হতে পারে। (এর সাথে আমাদের অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচিত একক ক্যালোরির সম্পর্ক আছে)। তবে আপাতত একক বোঝা লাগবে না। সংখ্যাটা মাথায় রাখলেই হবে।

আমরা হয়তো মনে করে বসতে পারি, এই শক্তির ঘনত্ব শূন্যস্থানের কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থেকে এসেছে। হিসাবটা জটিল। তবে তাত্ত্বিকরা অনেকটা পথ এগিয়েও গেছেন। হিসাবটাকে নিয়মবদ্ধ করার পথ তারা পেয়ে গেছেন। এটা করতে হলে ইচ্ছামতো একটি বিন্দু ধরে নিয়ে সর্বোচ্চ শক্তির অংশগুলো বাদ দিতে হয়। খুব বেশি খুঁটিনাটি না ভেবে প্রাপ্ত মানটাকে সঠিক ধরে নিলে ভ্যাকুয়াম শক্তির ঘনত্ব পাওয়া যায় প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ১০^১০৫ জুল-এর মতো। পর্যবেক্ষণের সাথে এর পার্থক্য যোজন যোজন। শুধু পার্থক্যেরই মান একশ বিলিয়ন বিলিয়ন গুগল (১০^১২০। মহজাগতিক ধুব্রকের প্রয়োজন নিয়ে এখন আর বিতর্ক হয় না। বিতর্কের বিষয় হলো, এর মান এত ছোট কেন।

আছে আরও একটি অপ্রতীকির সমস্যা। কণাপদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেল মূলত এক গুচ্ছ কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের সমষ্টি। এ তত্ত্বগুলো বিশেষ আপেক্ষিকতার শর্ত পূরণ করে। তবে সমস্যা হলো এরা অনুমান করে নেয় স্থান-কালের পটভূমি স্বাধীন থাকবে। কাঠামোর উপস্থিতির পূর্বানুমান করে এরা। এদেরকে গড়েই তোলা হয়েছে এমনভাবে যে এরা পরম স্থান-কালের আধারে থেকে আণুবীক্ষণিক ও কোয়ান্টাম আকারের বস্তুর ধর্ম ও আচরণ ব্যাখ্যা করবে। তর্কযোগ্যভাবে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার পরম স্থান ও কালের সঙ্গে এর তেমন পার্থক্য নেই। এ ধরনের স্থান-কাল কাজ করে পরোক্ষভাবে। নীরব দর্শকের মতো কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ফলাফলগুলোকে প্রকাশিত হতে দেখে।

অন্যদিকে বিগ ব্যাং কসমোলজির স্ট্যান্ডার্ড মডেল নির্মিত হয় আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা থেকে। এ তত্ত্ব পটভূমির ওপর অনির্ভরশীল। এটি আগেই কাঠামোর অস্তিত্ব অনুমান করে নেয় না। বরং তত্ত্ব থেকে গতিশীল চলক হিসেবে স্থান-কাল বেরিয়ে আসে। এখানে স্থান-কাল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ভর-শক্তি স্থান-কালকে প্রভাবিত করে। স্থান-কাল আবার প্রভাবিত করে ভর-শক্তিকে। ফলে পদার্থবিজ্ঞানে স্থান-কাল প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

সার্বিক আপেক্ষিকতা নিশ্চতভাবেই মকাকর্ষীয় ক্ষেত্রের (gravitational field) তত্ত্ব। কিন্তু এটি একটি চিরায়ত ফিল্ড, কোয়ান্টাম ফিল্ড নয়। ম্যাক্সওয়েলের চিরায়ত তড়িচ্চুম্কীয় ক্ষেত্রের মতোই এটি বৈশিষ্ট্যসূচক ফ্লাকচুয়েশন বা উত্তেজনা প্রদর্শন করে না। করে থাকলে আমরা তাকে ফিল্ড বা ক্ষেত্রের কোয়ান্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারতাম। সার্বিক আপেক্ষিকতা সত্যিকার অর্থে কোনো ক্ষেত্র কণা (field particle) নেই। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের এমন কোয়ান্টা বর্তমানে আছে শুধু কল্পনাতেই। কল্পিত এ কণার নাম গ্র্যাভিটন। ১৯৫৯ সালে ডিরাক নামটি দেন।

ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, আইনস্টাইন এ অসংগতি সম্পর্কে জানতেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, আইনস্টাইন নিজের সার্বিক আপেক্ষিকতা বার্লিনের প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে অনেকগুলো লেকচারের মাধ্যমে তুলে ধরেন। ১৯১৫ সালের ২৫ নভেম্বর তারিখে দেন চূড়ান্ত বিজয়দীপ্ত লেকচারটি। অথচ কয়েক মাসের মধ্যেই সেখানে ফিরে গিয়ে বললেন, তত্ত্বটা হয়তো পরিবর্তন করা লাগবে।

পরমাণুর ভেতরে ইলেকট্রনের গতির কারণে নগণ্য পরিমাণে হলেও ইলেকট্রনের মহাকর্ষ ও তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি বিকিরণ করার কথা। তবে প্রকৃতিতে এমন কিছু হয় না। ফলে মনে হচ্ছে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব শুধু ম্যাক্সয়েলের তড়িৎগতিবিদ্যাই নয়, পরিবর্তন করে দেয় মহাকর্ষ তত্ত্বকেও।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও সার্বিক আপেক্ষিকতাকে এক করে আমরা পাই মহাকর্ষ বলের কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি। অন কথায়, মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (quantum theory of gravity)। এটি স্থান-কালে নিজেরই একটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

হয়তো ভাবতে পারেন, একটা ‌‌‌জিনিসের এমন স্পষ্ট অনুপস্থিতি পরেও কণাপদার্থবিদ্যা ও বিগ ব্যাঙ কসমোলজির বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড মডেল কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে! এর সরল উত্তর হলো, দুই মডেলেই যে বল কাজ করে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্কেলে কাজ করে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব কাজ করে আণুবীক্ষণিক, অতিনিউক্লীয় (subnuclear), অতিপারমাণবিক, পারমাণবিক ও আণবিক স্কেলে। এসব জগতে ক্রিয়াশীল বলগুলো তুলনামূলক শক্তিশালী। অন্যদিকে, সার্বিক আপেক্ষিকতা কাজ করে বড় বস্তুর জগতে। কাজ করে মানুষ, রকেট, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ ও পুরো মহাবিশ্ব নিয়ে। কণাপদার্থবিদ্যার বলগুলোর তুলনায় স্তান-কালের বক্রতায় সৃষ্ট মহাকর্ষ ‘বল’ মারাত্মক দুর্বল।

মহাকর্ষের সাথে আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা হয়তো বলবে ভিন্ন কথা। মহাকর্ষের কারণেই আমরা উপর থেকে পড়ে গিয়ে পা ভাঙি। আসুন, একটি সরল পরীক্ষার মাধ্যমে মহাকর্ষ ও তড়িচ্চুম্বকত্বের তুলনামূলক শক্তি সম্পর্কে জেনে নেই। কাজটা করতে পারবেন বাসায় বসেই। করতে হবে শুধু এ কাজগুলো:

১. টেবিলের ওপর একটি ধাতব পেপার ক্লিপ রাখুন।

২. এর ওপর থেকে একটি ছোট চুম্বককে ধীরে ধীরে নীচে নামান।

৩. একসময় পেপার ক্লিপটি চুম্বকের আকর্ষণে ওপরে উঠে যাবে। যুক্ত হয়ে যাবে চুম্বকের সাথে।

অভিনন্দন! এইমাত্রই আপনি দেখালেন, পেপার ক্লিপকে টানার লড়াইয়ে একটি ছোট চুম্বক হারিয়ে দিয়েছে পুরো পৃথিবীর মহাকর্ষকে।

প্রকৃতির বলগুলোর শক্তির এ বিশাল পার্থক্যের ভালো ও খারাপ দুই দিকই আছে। এর ভালো দিক হলো, মৌলিক কণাদের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে কাজ করার সময় আমরা স্থান-কালের বক্রতা ও তার মহাকর্ষীয় প্রভাব নিশ্চিন্তে উপেক্ষা করতে পারি। এক্ষেত্রে ভরের পরিমাণ সামান্য, মহাকর্ষও তাই দুর্বল। এ প্রভাব ফলাফলে কোনো বাস্তব ভূমিকা রাখে না (আর আইনস্টাইন বলেছিলেন, ‘খুব নগণ্য পরিমাণ’)। একইভাবে সার্বিক আপেক্ষিকতা দিয়ে আমরা গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ ও মহাবিশ্বের বড় স্কেলের কাঠামোর ব্যাখ্যা দিতে পারি। এ জিনিসগুলোর উপাদান পরমাণু, কোয়ার্ক ও ইলেকট্রনদের ওপর ক্রিয়াশীল বল হিসাব করার প্রয়োজন হয় না।

আর খারাপ দিক হলো, যে স্কেলে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে তা মারাত্মক ক্ষুদ্র। সংশ্লিষ্ট শক্তির স্কেলও মারাত্মক ক্ষুদ্র। কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দিয়ে এত ছোট স্কেলের প্রভাব পরিমাপ করার কথা বর্তমান বা ভবিষ্যতেও ভাবা যায় না।\*২ এরই নাম প্ল্যাংক স্কেল। আগের অধ্যায়ের শেষে কার্লো রোভেলি এর কথাই বলেছেন। এ স্কেলের মান বের করতে অল্প কয়েকটি নির্দিষ্ট মৌলিক ভৌত ধ্রুবক প্রয়োজন হয়। প্ল্যাংক দৈর্ঘ্যের মান প্রায় ১০-৩৫ মিটার। যা একটি প্রোটনের ব্যাসার্ধের দশ হাজার কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। সার্নের লার্জ হ্যাড্রোন কোলাইডার পৃথিবীতে কণার সংঘর্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপন্ন করে। এখানে প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, প্ল্যাংক শক্তির মান তার চেয়ে দশ কোটি কোটি গুণ বেশি।

আমাদের বিশ্বাস, বিগ বাংয়ের একদম পা্রথমিক মুহূর্তে মহাবিশ্ব প্ল্যাংক স্কেলের দেখা পেয়েছিল। কিন্তু সেটা ১৩৮০ কোটি বছর আগের কথা। পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা কখনও এর কাছেধারেও যেতে পারবে না। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এত ভাবনা কীসে? কোয়ান্টাম তত্ত্বকে মৌলিক কণা আর সার্বিক আপেক্ষিকতাকে বড় জিনিস ও মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেই তো হয়। তাতে তো সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে। আসলেই কি চলছে? একদম না। আমরা বুঝতেই পারছি, এমন একটি সার্বিক তত্ত্ব থাকা উচিত, যা নীতিগতভাবে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে পারবে। এছাড়াও সার্বিক আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার স্থান-কালের কাঠামোকে আমরা আলাদা চোখে দেখি। আমাদের সন্দেহ, এ দুই তত্ত্বের এ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীও অন্তত কিছুটা দায়ী।

আর কেউ না হোক, ফাইনম্যান অন্তত মনে করতেন না, হাস্যকর মাত্রার শক্তি প্রয়োজন হবে। তিনি বরং মনে করতেন, সূক্ষ্ম পরিমাপের মাধ্যমে একদিন কোয়ান্টাম মহাকর্ষীয় প্রভাব পরীক্ষাগারেই দেখা সম্ভব হবে।

দুই ক্ষেত্রেই আমাদের প্রকৃতির বিবরণে মহাকর্ষের কোয়ান্টম তত্ত্ব খুব সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত। ফলে কিছু কিছু তাত্ত্বিক এমন তত্ত্ব তৈরির প্রলোভন কিছুতেই এড়াতে পারছেন না। প্রচেষ্টার শুরু ১৯৩০ সালে। স্বতন্ত্রভাবে কাজ শুরু করেন বেলজিয়ান পদার্থবিদ লিয়ন রোজেনফেল্ড, সোভিয়েত পদার্থবিদ মাতভেই ব্রনস্টিন ও পাউলি। এ প্রচেষ্টাগুলো ছিল খুবই অপিরপক্ব। শুরুতেই এসব চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়ে। ব্যহত করে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির প্রাথমিক বিনির্মাণকেও।

অবশ্য বোঝা গিয়েছিল, প্রধান রাস্তা আছে দুটি। এখান (কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও সার্বিক আপেক্ষিকতা) থেকে সেখানে (মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব) যাওয়ার আছে দুটি পথ।

এখন, ভৌত গতিবিদ্যার সাথে অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশের অনেকটা মিল আছে। হিসাবরক্ষকরা একটি ব্যবসার গ্রাহক ও পরিবেশকের মধ্যে অর্থের গতির ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। আর পদার্থবিদরা এক ভৌত সিস্টেম বা অবস্থার শক্তির পরিবহনের সাথে অন্য অব্স্থাকে ভারসাম্যে রাখার জন্য সমীকরণ খোঁজেন। মাহবিশ্বের একটি মৌলিক সূত্র হলো, শক্তি সংরক্ষিত থাকে। বিভিন্ন কণা ও বলের (force) মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। তবে শক্তির বহিঃপ্রকাশ মূলত দুইভাবে হয়: গতিশক্তি (kinetic energy) ও বিভব বা সুপ্ত শক্তি (potential energy)।

সরল অর্থে গতিশক্তি হলো গতির সাথে সম্পর্কিত শক্তি। বিভবশক্তির ধারণা এর চেয়ে কিছুটা জটিল। এটি দ্বারা কোনো ভৌত সিস্টেমে সংরক্ষিত বা সুপ্ত শক্তিকে বোঝানো হয়। বিভবশক্তিকে সহজে বুঝতে একটি দোলকের (pendulum) কথা ভাবুন। এটি দোল খাচ্ছে বাঁয়ে-ডানে। বাঁয়ে বৃত্তচাপ বরাবর চলে এটি একসময় থেমে যায়। যখন পৌঁছে যায় সর্বোচ্চ দূরত্বে। একটু পরেই আবার উল্টো দিকে গতিশীল হয়। থেমে থাকার সময় এর সবটুকু শক্তি বিভবশক্তি হিসেবে জমা থাকে। মহাকর্ষের আকর্ষণে পরে আবার এটি ডানে ঘুরে চলতে থাকে। বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে হতে গতিও বাড়তে থাকে। এ প্রক্রিয়া চিরকাল চলতে থাকার পথে নীতিগত কোনো বাধা নেই। কিন্তু যান্ত্রিক ঘর্ষণ ও বাতাসের বাধার কারণে শক্তি অপচয় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একসময় এসে দোলক থেমেই যায়।

একটি বিষয় জানলে সুবিধা হতে পারে। নিউটন পরবর্তী সময়ে চিরায়ত গতিবিদ্যাকে বিস্তৃত করতে গিয়ে পদার্থবিদরা বিভবশক্তি ও নিউটনের বলের ধারণার মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্ক তৈরি হয় দোলকের বিভবশক্তি ও সরণের (দূরত্ব) মধ্যে। দোলনের সবোর্চ্চ বিন্দুতে বিভবশক্তির কার্ভ সবচেয়ে খাড়া।#২ আর এখানেই দোলকের ওপর সবেচেয়ে বেশি বল প্রযুক্ত হয়।

গতিশক্তি আয়বিবরণী হলে বিভবশক্তি হলো ব্যালেন্স শিট। একটি ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হলে দুটোই দরকার। যান্ত্রিক কোনো সিস্টেমে গতিশক্তি ও বিভবশক্তির যোগফলকে বলে সিস্টেম হ্যামিল্টোনিয়ান। নামটি এসেছে আইরেশ পদার্থবিদ ও গণিত‌‌‌বদ উইলিয়াম রোয়ান হ্যামিল্টনের নাম থেকে।

কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি তৈরির নিখুঁত এক ছক আঁকেন ডিরাক। একটি চিরায়ত ফিল্ড (যেমন ম্যাক্সওয়েলের চৌম্বক ক্ষেত্র) দিয়ে শ‌‌‌ুরু করুন। এবার এর মোট শক্তি বের করুন। এটাই এর হ্যামিল্টোনিয়ান। এবার একে কোয়ান্টাম রূপ দান করে সুসংহত করুন। সেজন্য লাগবে দুটি গাণিতিক কৌশল। এ কৌশলগুলো জানে কীভাবে চিরয়াত বৈশিষ্ট্যকে কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করতে হয়। এছাড়াও এ কৌশলগুলো জন্ম দেয় ফিল্ড কোয়ান্টার। যাকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায়। তবে এর সবকিছুই করা হয় চিরায়ত তত্ত্বের কাঠামো ঠিক রেখেই।

এই ছকেরই নাম আদর্শ কোয়ান্টায়ন (canonical quantization)। এ প্রক্রিয়ায় কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি দিয়ে চিরায়ত তত্ত্বের খুব কাছাকছি প্রাথমকি একটি মান পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিই আসলে ডিরাকের *লেকচারস অন কোয়ান্টাম মেকানিক্স* বইয়ের বিষয়বস্তু।

কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্বের প্রথম রাস্তাটি ডিরাকের ছক মেনেই বানানো। কাজ শুরু হয় সার্বিক আপেক্ষিকতা দিয়ে। আইনস্টাইনের মহকর্ষীয় ক্ষেত্র সমীকরণকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এক গুচ্ছ চিরায়ত হ্যামিল্টোনিয়ানের ভেতর। এভাবেই হয় কাজের সূচনা। সার্বিক আপেক্ষিকতার এ গতিশীল বহিঃপ্রকাশকে অনেকসময় বলে জ্যামিতিগতিবিদ্যা (geometrodynamics)। ঠিক যেভাবে ইলেকট্রিক চার্জের মিথস্ক্রিয়া আলোচিত হয় কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যায় (QED)। তো, এর পর প্রয়োজন অনুসারে আদর্শ কোয়ান্টায়ন ব্যবহার করে সুসংহত করা হয়। ফলে আমরা QED-এর মতো করে কোয়ান্টাম জ্যামিতিগতিবিদ্যা পাই।

তবে সার্বিক আপেক্ষিকতার স্থান-কাল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ওদিকে তড়িচ্চুম্বকত্বের স্থান-কাল কাজ করে পরোক্ষভাবে। ফলে এখান থেকে আমরা খুবই ভিন্ন ধরনের একটি সম্ভাবনা পাই। সার্বিক আপেক্ষিকতায় ‘এখানে’ এবং ‘ওখানে’ বা ‘এখন’ ও ‘তখন’ কথাগুলোর পরম কোনো অর্থ নেই। তত্ত্বটি বরং কাজ করে স্থান-কালের ব্যবধান নিয়ে। সার্বিক আপেক্ষিকতা স্তান ও কালকে দেখে সমান চোখে। এ কারণে আমরা হয়তো কল্পনা করে বসতে পারি, তত্ত্বটির কোনো গতিশীল সংস্করণকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে চারটি স্থান-কালেরই ব্যবধানের পরিবর্তন দেখাতে হবে। তিনটি ব্যবধান স্থানের ও একটি কাল কা সময়ের।

কিন্তু ডিরাক দেখলেন ভিন্ন জিনিস। ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকের কথা। ডিরাক এ পথেই হেঁটে দেখলেন কী হয়। তিনি দেখতে পেলেন, সার্বিক আপেক্ষিকতার তথাকথিত সীমাবদ্ধ হ্যামিল্টোনিয়ান সূত্রায়নে গতিবিদ্যা নিয়ন্ত্রণ করে চারটি স্থান-কাল ব্যবধানের মধ্যে মাত্র তিনটি। ভর-শক্তির ভাগ্যনির্ধারক জ্যামিতিক সম্পর্ক বিষয়ক সব তথ্য তিনটি স্থান-কালের মধ্যেই থাকে। এ সম্পর্কগুলোকে তিনটি স্থানিক (spatial) মাত্রার ব্যবধান বলেই মনে হলো।

সার্বিক আপেক্ষিকতাকে এভাবে নবসূত্রায়ন (reformulation) চতুর্মাত্রিক স্থানকাল ফের ‘৩+১’ কাঠামোর জন্ম দেয়। সময় একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। তবে হয়ে গেছে রহস্যময়। আসলে নতুন এ সূত্রায়নে স্থানিক জ্যামিতির পরিবর্তনশীল সম্পর্ককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। আদর্শ কোয়ান্টায়নের কৌশলকে এ ধরনের সূত্রায়নে ব্যবহার করার অর্থ হলো, স্থান-কাল নয়, বরং স্থান কোয়ান্টায়িত। ডিরাক বলেন, ‘এ ফল দেখে আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম, পদার্থবিদ্যায় চারটি মাত্রা আসলে খুব কি প্রয়োজন?’

ডিরাক গণিতে যথেষ্ট পাকা ছিলেন। তবে সমাধানের পথে খুব বেশি এগোতে পারেননি। তাঁর *লেকচারস অন কোয়ান্টাম মেকানিক্স* বইয়ে ব্যাপারটার সারমর্ম তুলে ধরেন এভাবে:

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষ কিছুটা চেষ্টা করেছে, যাতে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যে নিয়ে আসা যায়। তবে আমার মনে হয়, এ কাজটার পেছনে মূল প্রত্যশা ছিল ভিন্ন। আশা করা হয়েছিল, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কিছু অসুবিধা দূর করা যাবে। বর্তমানে দেখে যতটা বোঝা যাচ্ছে, সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রকে নিয়ে আসলে সমস্যা দূর হওয়ার বদলে বরং আরও নতুন সমস্যার উদয় হচ্ছে।

১৯৫৯ সালে চার্লস মিসনার তাঁর দুই মার্কিন স্বদেশী রিচার্ড আর্নোউইট ও স্ট্যানলি ডিসারের সঙ্গে কাজ করে সার্বিক আপেক্ষিকতার সীমাবদ্ধ হ্যামিল্টোনিয়ান সূত্রায়ন প্রকাশ করেন। এটাই তাঁদের নামানুসারে এডিএম সূ্ত্রায়ন (ADM formulation) হিসেবে পরিচিতি পায়। আরেক মার্কিন তাত্ত্বিক ব্রাইস ডিউইট কাজ করতেন *ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি* কেন্দ্রে। ১৯৬৬ সালে তিনি এডিএম সূত্রায়ন ব্যবহার করে সরল ফ্রিডম্যান মহাবিশ্বের জন্য একটি আদর্শ কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি বানান।

কসমোলজির জন্য বানানো প্রথম কোয়ান্টাম তত্ত্ব এটাই।

‘মহাবিশ্বের তরঙ্গ ফাংশন’ কথাটি এই প্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এল। ডিউইট দেখলেন, এমন তরঙ্গ ফাংশন শুধু স্থানিক জ্যামিতির ওপর নির্ভর করে। সময় থেকে গেল ধরাছোঁয়ার বাইরে। তরঙ্গ ফাংশনটি একটি স্থির ও মডেল মহাবিশ্বের কথা বলে। যার মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য। তিনি লেখেন: 'অতএব বলা যায়, কোয়ান্টাম (জ্যামিতিগতিবিদ্যায়) কোনো কিছুই ঘটে না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব কেবল বিশ্বের একটি স্থির চিত্রই প্রদান করতে পারে। এই মহাবিশ্বে কোনোকিছু ঘটাতে হলে সময়কে নিয়ে আসার উপায় খুঁজে পেতে হবে। তার জন্য অনেকগুলো আলাদা তরঙ্গ ফাংশনকে জোড়া দিতে হবে। প্রতিটি তরঙ্গ ফাংশন সুপারপজিশনের স্থানের ভিন্ন ভিন্ন কোয়ান্টাম অবস্থাকে প্রকাশ করবে। এরপর এ অবস্থাগুওলোকে বিবর্তিত হতে দিতে হবে।

কিন্তু মহাবিশ্বের তরঙ্গ ফাংশনের ব্যাখ্যা কী হবে? ডিউইটের এ ব্যাপারে পরিষ্কার কোনও ধারণা ছিল না। ফলে তিনি অতীতের উদাহরণ দেন। হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশন নিয়ে শ্রোডিংগার একইরকম অসুবিধায় পড়েছিলেন। এক্ষেত্রে তরঙ্গ ফাশন, বিশেষ করে সম্ভাবনা তরঙ্গের মাধ্যমে বর্নের ব্যাখ্যা কোয়ান্টাম তত্ত্বের কোপেনহ্যাগেন ব্যাখ্যায় অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু ডিউইট যুক্তি দেখিয়েছিলেন, মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বে কোপেনহ্যাগেন ব্যাখ্যা কোনোরকম কাজে আসে না।

কোপনেহ্যাগেন ব্যাখ্যা নির্ভর করে একটি পূর্বানুমিত চিরযায়ত স্তরের অস্তিত্বের ওপর। সকল চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্ক আছে এ স্তরের। কিন্তু এখানে পুরো মহাবিশ্বই পযবেক্ষণাধীন বস্তু। পর্যবেক্ষণের চিরায়ত কোনো সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। অতএব, ব্যাখ্যার প্রশ্নটা নিয়ে একদম শুরু থেকেই নতুন করে ভাবতে হবে।

ধরুন, সব কিছুই আছে মহাবিশ্বের অভ্যন্তরে। তাহলে এর বাইরে কোনো চিরায়ত পরিমাপ যন্ত্র থাকতে পারে না। থাকলে সেটা তখন মহাবিশ্বের তরঙ্গ ফাংশনকে ভেঙে দিতে পারত। এ কারণেই ডিউইট জোরালোভাবে বিকল্প পথে হাঁটেন। জোর প্রচারণা চালান কোয়ান্টাম তত্ত্বের বহুবিশ্ব ব্যাখ্যার। এ ব্যাখ্যায় তরঙ্গ ফাংশনের ভাঙনের ধারণা নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদেরকে তখন ভাবতে বসতে হবে, বাকি গাইনেথ প্যালট্রো??? দের ভাগ্যে কী ঘটল।

ডিউইট নিজের সমীকরণ পেতে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতাকে শ্রোডিংগারের তরঙ্গ গতিবিদ্যার সাথে জোড়া দেন। অতএব, তিনি এর নাম দেন আইনস্টাইন-শ্রোডিংগার সমীকরণ।\*৪ হুইলার ডিউইটের ফল ছড়িয়ে দিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। ফলে বাকিরা একে বলল, হুইলার-ডিউইট সমীকরণ।

তবে এখানেই ঘটনা থেমে থাকেনি। মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বের যাত্রাপথে হুইলার-ডিউইট সমীকরণ বড়জোর একটি স্টেশন। সে স্টেশন চূড়ান্ত গন্তব্য থেকে অনেক দূরে আছে। আসলে এখানে আছে অসীম এক গুচ্ছ সমীকরণ। আছে অনেক রকম টেকনিকেল অসুবিধা। এসব কারণে তাত্ত্বিকরা কোনো সামাধানে আসতে পারেননি। সার্বিকভাবে মহাবিশ্বের তরঙ্গ ফাংশন নিয়ে কথা বলা ভালো কথাই। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল, খুব শিগগিরই কেউই এমন একটি তরঙ্গ ফাংশনের রূপ লিখিত আকারে প্রকাশ করতে পারবেন না। পরবর্তীতে রোভেলি স্বীকার করেন, '[হুইলার-ডিউইট] সমীকরণে নানান অসুবিধা দেখা দেয়। এর গাণিতিক ভিত্তি সুসংজ্ঞায়িত ছিল না। আর এর ভৌত তাৎপর্য ছিল খুবই অস্পষ্ট।’

গুরুত্ব কমে গেল। ১৯৬০-এর শেষ ও ১৯৭০-এর দশক উচ্চশক্তির কণাপদার্থবিদ্যার সোনালী যুগ। এই যুগটা শেষ হতে হতে কণাপদার্থবিদ্যার মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেল। অপেক্ষা শুধু কোলাইডার পরীক্ষায় বাকি অদেখা কণাগুলোর আবিষ্কারের মাধ্যমে শূন্যতা পূরণের।

আর কণাপদার্থবিদরা ভিন্ন কিছুর সন্ধান পেয়ে গেলেন।

মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বের দ্বিতীয় রাস্তাটি দিয়ে পথ চলা শুরু হয় কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি থেকে। পরে সেটাকে আইনস্টাইনের সাধারণ সহভেদ নীতির (principle of general covariance) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়। অন্য কথায়, শুরু করুন কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি দিয়ে। এবার একে করুন পটভূমি-নিরপেক্ষ। একে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের সহভেদ পদ্ধতি বলা হয়।

এ পদ্ধতিতে মূল গুরুত্ব দেওয়া হয় কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিকে। কনাপদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেল তৈরিতে এ তত্ত্ব একের পর এক সাফল্য পাচ্ছিল। এখানে সার্বিক আপেক্ষিকতার স্থান-কালের মেট্রিককে দুই অংশে ভাগ করা হয়। প্রথমটি হলো পরোক্ষ ও সাধারণত সমতল বা তথাকথিত মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রবিহীন মিংকোফস্কি স্থান-কাল। দ্বিতীয় অংশটি দিয়ে সমতল বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুতি দেখানো হয়। এটা দিয়েই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ফ্লাকচুয়েশন বোঝানো হয়। অতঃপর এ ফিল্ডকে কোয়ান্টায়িত করা হয়। এ থেকে প্রাপ্ত গ্র্যাভিটন কণা সমতল স্থান-কালে চলাচল করতে থাকে। প্রথমদিকে প্রাপ্ত ফলগুলোকে প্রতিশ্রুতিশীল মনে হচ্ছিল। এ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত গ্র্যাভিটনগুলোতে প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছিল।

ফাইনম্যান নিজেও জড়িয়ে পড়লেন এ কাজে। QED-এ সফলভাবে ব্যবহৃত কৌশলগুলো প্রয়োগ করলেন মহাকর্ষে। তাত্ত্বিকরা তত্ত্বটাকে পুনর্স্বাভাবিকীকরণ করতে প্রয়োজনীয় সবগুলো বিকিরণজাত সংশোধন হিসাব করার চেষ্টা করলেন। ডিউইটও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন এতে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল, এভাবে নির্মিত কোয়ান্টাম মহাকর্ষকে পুনর্স্বাভাবিকীকরণ করা সম্ভব নয়। চেষ্টা অনেকরকমভাবেই করা হলো। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক পর্যন্তও কেউ সফল হননি।

ফাইনম্যান অবশ্য খুব বেশি হতাশ হননি।

মহাকর্ষ ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাকে জোড়া দিতে গিয়ে নিজের প্রচেষ্টা নিয়ে আমি হতাশ নই। স্বীকার করছি, এ প্রচেষ্টা থেকে প্রাপ্ত ফলগুলোকে পুনর্স্বাভাবিকীকরণ যায় না...আমি সবসময় ভেবেছি, এর অর্থ কেবল এটাই যে আমরা বেশি দূর চলে গিয়েছি। আমরা কম দূরত্বে চললে বিশ্বকে অনেক আলাদা দেখায়।

তবে এখানে কিন্তু প্রধান গুরুত্ব থেকে গেছে কোয়ান্টাম ফিল্ডের ওপর। ফলে সহভেদ পদ্ধতিতে মহাকর্ষ ও স্থান-কালের জ্যামিতির মধ্যকার গভীর সম্পর্ক হারিয়ে যায়। অথচ সার্বিক আপেক্ষিকতার ভিত্তিই এ সম্পর্ক। কিছু কিছু গবেষক জীবনটাই বিলিয়ে দিয়েছেন সার্বিক আপেক্ষিকতার গবেষণায়। কোয়ান্টাম ফিল্ড তাত্ত্বিকদের পুনর্স্বাভাবিকীকরণের ওপর নির্ভরতাকে তাঁরা মন থেকে পছন্দ করেননি।

কিছু তাত্ত্বিক অবশ্য স্বীকার করেন, বিভিন্ন পথে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার কিছু সুবিধা আছে। তবে ধারণাগত পার্থক্য ও গবেষণা দলগুলোর মধ্যে মতের মিল এতই কম যে দুই পথের মিলন সম্ভব নয়। ক্যানোনিকেল পদ্ধতিতে জ্যামিতির প্রতি গুরত্বারোপ সার্বিক আপেক্ষিকতা ও মৌলিক কণার তত্ত্বের মধ্যে দেয়াল তুলে দিয়েছে। তবে কণাতাত্ত্বিকরা অসাধারণ সাফল্য পেয়েছেন। এ ধরনের বিজ্ঞানে মানুষের আগ্রহও হুহু করে বাড়ছে। ফলে তাঁদের বিশ্বাস জন্মেছে, সহভেদ পদ্ধতিই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পথ।

লি স্মোলিন ও কার্লো রোভেলি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্সের শেষ দিকে এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হন।

স্মোলিন আইনস্টাইনের *অটোবায়োগ্রাফিকেল নোটস* পড়েছিলেন। এ বই পড়েই তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হওয়ার অনুপ্রেরণা পান। এছাড়াও মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব তৈরিরও উৎসাহ পান। হার্ভার্ডে পিএইচডির সময় কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি পড়তে চেয়েছিলেন। তার কারণ, কণাপদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেল তৈরিতে সফলভাবে ব্যবহৃত কৌশলগুলো শিখে নেওয়া। আর তা ব্যবহার করা কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্বের জন্য। তবে শিক্ষকরা বলেছিলেন, শুধু বোকারাই এই সমস্যা নিয়ে কাজ করে। এসব কথা তাঁকে একটুও দমাতে পারেনি। থিসিস অ্যাডভাইজর সিডনি কোলম্যানকে যুক্তি দিয়ে বোঝানওর চেষ্টা করলেন। কোলম্যান তাঁকে ভিন্ন কোনও বিষয়ে কাজ করতে বলেছিলেন। কিন্তু স্মোলিন নিজের কথায় অনড়। কোলম্যান তাঁকে দুই বছর সময় দেন। এর মধ্যে কিছু একটা ফল পেতে হবে। আর না হলে QCD-এর বিকল্প কোনও সমস্যা ধরিয়ে দেবেন তাঁকে।

তবে তিনি স্মোলিনের আরেকটা বড় উপকার করেন। স্মোলিনের গবেষণা তদারকির কাজে নিজের সাথে তিনি স্ট্যানলি ডিসারকেও যুক্ত করে নেন।

কোয়ান্টাম মহাকর্ষের সমস্যা সম্পর্কে রোভেলি জানতে পারেন বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পড়াশোনার শেষ বর্ষে। ইংরেজ পদার্থবিদ ক্রিস ইশামের একটি গবেষণাপত্র হাতে পান তিনি। ইশাম লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে কাজ করতেন। ১৯৭৪ সালে ব্রিটেনে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের ওপর এক সিম্পোজিয়াম আয়োজিত হয়। এর ভেন্যু ছিল অক্সফোর্ডের কাছে হারওয়েল গ্রামের অ্যাটোমিক এনার্জি রিসার্চ ইস্টাবলিশমেন্ট। আলোচ্য গবেষণাপত্রখানা প্রকাশিত হয়েছিল সিম্পোজিয়াম পরবর্তী সংকলনে।

ইশামের এ প্রাথমিক গবেষণা থেকেই পরিষ্কার মনে হলো, কোয়ান্টাম মহাকর্ষ নানাবিধ জটিল সমস্যায় আক্রান্ত। পরিস্থিতিটা ছিল অসম্ভব রকম হতাশাজনক। কিন্তু রোভেলির তরুণ রক্ত তখন উদ্যমে ভরপুর। দার্শনিক মন স্থান ও কালের ধারণায় বুঁদ হয়ে থাকতে উদগ্রীব। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের??? সঠিক মোহনায় ছিল তাঁর অবস্থান।

রোভেলির শিক্ষকরা তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে চাইলেন। বললেন, এমন জটিল ও অনুর্বর বিষয়ে গবেষণা করলে কখনোই চাকরি পাবেন না। কিন্তু স্মোলিনের মতোই তিনি অবিচল থাকলেন। পরে বলেছিলেন, 'অনেকসময় বুড়োদের সাবধানবাণী তরুণদের জেদ শুধু বাড়িয়েই দেয়।’

কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে তিনি একটি বই সম্পাদনা করেন। এতে ছিল ১৯৭৭ সালের মার্চে বোলোনিয়ায় সংঘটিত ঘটনার বিবরণ। ঐ ঘটনায় একজন তরুণ যোদ্ধা মারা যায়। রেডিও এলিসের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী কয়েকদিন চলে উত্তেজিত বিক্ষোভ, অবরোধ ও দাঙ্গা। 'মতা প্রকাশের অপরাধে’ রোভেলি গ্রেপ্তার হন। স্থানীয় থানায় মারও খান।

ছাত্ররাজনীতির নেশা মাথায় থাকলেও কোয়ান্টাম মহাকর্ষের সমস্যার কথা ভুলে যাননি। কয়েকদিন পরই ডক্টরেট করতে চলে আসেন পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। থিসিস পরামর্শক ছিলেন রোভেলির একদম মনোমতো। তিনি রোভেলিকে নিজের মতো করে কাজ করার সুযোগ দেন। ফলে রোভেলি স্বাধীনভাবে পড়াশোনার সুযোগ পেলেন। সঙ্গীরা যখন গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করছেন, রোভেলির মাথা তখন নিচু।

তখন তিনি জানতে ও বুঝতে চাচ্ছিলেন।

টীকা (অনুবাদক)

#১। প্রতিকণা নিয়ে আরও জানতে পড়ুন অনুবাদকের বিজ্ঞানচিন্তায় প্রকাশিত লেখা: কণা ও প্রতিকণার লড়াই। (অনলাইনে পড়ুন এখানে )।

#২। চিত্র ১৪.১

x অক্ষে সময় ও y অক্ষে দোলকের বিভবশক্তি নিয়ে গ্রাফ আঁকলে কেমন হয় দেখা যাক। ...

টীকা (লেখক)

\*১। সত্যি বলতে এগুলো সময়ের কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন নয়। তবে তার সাথে মিল আছে কিছুটা। কোয়ান্টাম ক্ষেত্রের সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের (ভ্যাকুয়াম) শক্তি শূন্য হতে পারে না (এটা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। বরং এর থাকে একটি গর শক্তি। যার নাম শূন্য-বিন্দুর শক্তি (zero-point energy)। প্রত্যেকটি আলাদা কোয়ান্টাম ক্ষেত্রের শূন্য-বিন্দুর শক্তি যোগ করে ভ্যাকুয়াম এনার্জির ঘনত্বের একটি তাত্ত্বিক হিসাব পাওয়া যায়।

\*২। তবে বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আরও বিস্তারিত দেখুন ১৪শ অধ্যায়ে।

\*৩। যারা ব্যবসার অ্যাকাউন্টিং নিয়ে জানেন, তারা এটাও জানেন, ব্যবসার টিকে থাকা নির্ভর করে নগট টাকার প্রবাহের ওপর। আর এ প্রবাহ নির্ভর করে আয়বিবরণী ও ব্যালেন্স শিট—দুটোরই ওপর।

\*৪। একান্তে তিনি অনেকসময় একে অভিশপ্ত সমীকরণ বলতেন।

সপ্তম অধ্যায়

শয়তানের নানীর উপহার

সত্যি বলতে, তাত্ত্বিক পদার্থবিদকে কখনো শূন্য থেকে কাজ শুরু করতে হয় না। মৌলিক কণা বা মহাবিম্বের ভৌত বৈশিষ্ট্য ব্যাখা করতে প্রয়োজনীয় গাণিতিক কাঠামোর চেহারা-সুরত হয়তোবা ব্যাপক হতে পারে, তবে সেটা অসীম নয়। আর ভাগ্য বিদ্রোহীদের সহায় হলেও জানা কাঠামো ব্যবহার করার ঝোঁক থেকেই যায়। সমসাময়িক অস্ত্র দিয়ে লড়াই করেই হয় বিপ্লব।

আমার মনে হয়, একটি তত্ত্বের কাজের ধারা কল্পনা করাটা খুব বেশি কঠিন কোনো কাজ নয়। আগেকার দিনে বহু উপাত্ত (data) পড়ে থাকত ব্যাখ্যাহীন অবস্থায়। বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব দাঁড় করাতে হাঁটতেন চেনাজানা পথে। ব্যবহার করতেন এমন কাঠামো, যা দিয়ে গাণিতিকভাবে কাজ এগিয়ে নেওয়া যাবে। যেমন ধরুন বিন্দুকণা (যাদের ভর কেন্দ্রের অতিশয় ক্ষুদ্র বিন্দুতে পুঞ্জীভূত থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়), বর্ধিত ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র, ঘূণয়মান বস্তুর গতি ও কম্পন ইত্যাদি। তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে তাঁরা দেখতেন, প্রাপ্ত উপাত্তের সাথে তা খাপ খাচ্ছে কি না। তবে থেমে থাকতেন না তাতেই। দিতেন নতুন ও সাধারণত বিচিত্র কিছু পূর্বাভাসও। যেগুলো কোনো পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণে যাচাই করে দেখা যাবে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন উপাত্ত পাওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেেত্রে বিজ্ঞানীরা আরেকটি কাজ করতে পারেন। নিয়ে আসতে পারেন নতুন কোনো ধারণা। দিতে পারেন নতুন কোনো তত্ত্ব, যা প্রাপ্ত উপাত্তকে আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবে। অথবা ব্যাখ্যার কোনো অপূর্ণতা দূর করে প্রচলিত উপাত্তকে আরও ভাল যৌক্তিক ভিত্তি দান করবে। অনেকসময় এটা করতে গিয়ে প্রচলিত তাত্ত্বিক ধারণাকে একদম নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হয়। আগে হয়তো মনে হয়েছিল, এর অর্থ এটা, কিন্তু পরে দেখা গেল এর অর্থ কিছুটা ভিন্ন অথবা (বেশি চরম অবস্থা হলে) একেবারেই ভিন্ন কিছু।

দুই ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিকদের কাজ শুরু হয় বড় একটি ভাবনার (big idea) মাধ্যমে। এ চিন্তার উদয় ঘটে প্রকৃতিকে second-guess করার চেষ্টা থেকে। তাত্ত্বিকরা প্রশ্রয় দেন তাদের মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অধিবিদকে (metaphysician)। ব্যাপারটা অনেকটাই প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিকদের মতো। তারা নিজেদেরকে 'যদি এমন হয় তাহলে কী হবে' ধরনের প্রশ্ন করেন। আর সম্ভাব্য উত্তরগুলো জানতে ব্যবহার করেন পরীক্ষীত ও বিশ্বস্ত হাতিয়ার। অথবা শুধুই দেখতে চান, গাণিতিক যুক্তি তাদেরকে কোথায় নিয়ে যায়।

স্ট্যান্ডার্ড মডেল ও কণাপদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র তত্ত্বগুলো (field theories) বিস্ময়কররকম উর্বর। ১৯৭০-এর দশকে এ মডেল জনমনে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি করে। ফলে তাত্ত্বিকরা ভাবলেন, এ মডেল কাজ শুরুর বেশ ভালো একটি রাস্তা হবে।

দুর্বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের একীভবন দারুণভাবে সফল হয়েছে। ফলে পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে কাউকে ভাবতে হয়নি। সবল কালার ফোর্সকেও একীভূত করে একটিমাত্র তড়িৎনিউক্লীয় বল বানিয়ে নিলে কেমন হবে? এর অর্থ হবে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল সকল কোয়ান্টাম ক্ষেত্র ও বল আসলে আরও অনেক বড় ও একীভূত উচ্চ প্রতিসাম্যের (higher symmetry) ক্ষেত্রের ভাঙা ধ্বংসাবশেষ।

তবে এখানেই না থামি। বস্তুকণা (ফার্মিয়ন) ও বলকণার (বোসন) মধ্যেও যদি প্রতিসাম্য থাকে? যদি স্ট্যান্ডার্ড মডেলের প্রতিটি কণার থাকে একটি করে সঙ্গী? ঠিক যেভাবে সব কণার আছে প্রতিকণা। বাস্তব ভৌত মৌলিক সত্তারা যদি কণাই না হয়? যদি বরং হয় স্ট্রিং নামের শক্তির এক, দুই বা তিন মাত্রার ফিলামেন্ট?

প্রকৃতির রহস্যভেদী তাত্ত্বিকদের জন্য বিশেষ একটি সুবিধা আছে। তাদের কল্পনার ঘোড়া ছুটতে পারে দিগ্বিবিদক। পাগলের মতো ছোটার অনুমতি না থাকলেও ছুটতে পারে উত্তেজিত ভঙ্গীতে। হ্যাঁ, বড় বড় চিন্তাগুলোরও আছে সীমাবদ্ধতা। যে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা সে দিতে চায় সেটিই তাকে সীমিত করে দেবে। তবে লাজুক থেকে কেউ কোনো বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটাতে পারেন না।

ফলে এ কৌশলের আছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ও অসুবিধা।

তাত্ত্বিকরা খুঁজে ফিরছেন গণিতের ঘন জঙ্গলে। হারিয়ে যাওয়া খুবই সহজ (মেন আইনস্টাইন হারিয়েছিলেন টেনসর ক্যালকুলাসের মধ্যে)। লক্ষ্য ভুলে যাওয়া তো আরও সোজা। তাদের ছুটতে হয় এমন ফলের পেছনে, যাকে গাণিতিকভাবে অর্থপূর্ণ হতে হবে। এতে করে অনেকসময় আলোচনায় ওঠে আসে অস্পষ্ট কিছু ধারণা। পরবর্তীতে এরকম ধারণাগুলোর ভৌত অর্থ বা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করব। এ অর্থ বা ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদেরকে কোনো অুসবিধায় ফেলে না। বা বলা যায়, ফেলতে পারে না। তাঁরা বোধগম্য কোনো কাঠামো খোঁজেন না। খোঁজেন এমন তত্ত্ব যা কাজ করবে। সেটা কতটা সন্তোষজনক হলো তা নিয়ে তারা ভাবেন না (ভাবেন না, পরবর্তীতে তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তোলা কতটা সহজ হবে)।

তবে পরের বড় trade-off টা বেশ অসুবিধাজনক। এর সাথে সম্পর্ক আছে আমাদের 'তত্ত্ব' শব্দটির ব্যাখ্যায়। আসলে থিওরি বা তত্ত্ব শব্দটাকে আমরা একেক সময় একেক অর্থে ব্যবহার করি। যেমন– ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়ার ব্যাপারে পক্ষের নাগরিকরা কেন অল্প ব্যবধানে জিতেছিলেন সে ব্যাপারে আমার একটি থিওরি আছে। অথবা– ট্রাম্প কেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন সে ব্যাপারে আমার একটি থিওরি আছে। আমরা সবাই একমত, এগুলো শধুই থিওরি।

তবে বিজ্ঞানীদের কাছে সফল তত্ত্বের মানে এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু। ধারণাগুলো অনেকসময় অস্পষ্ট হতে পারে। তবুও এ তত্ত্বগুলো আমাদেরকে প্রকৃতির কার্যক্রম সম্পর্কে গভীর অর্থবহ কিছু কথা বলে। নিউটনের গতিবিদ্যা, আইনস্টাইনের বিশেষ ও সার্বিক আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার মতো তত্ত্বগুলোকে সাধারণভাবে বাস্তবতার 'সঠিক' (contingent) বহিঃপ্রকাশ১ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ বোঝার ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বলে কীভাবে আমরা আমাদেরকে এখানে খুঁজে পেলাম। শুধু কি খুঁজেই পেয়েছি? সে জায়গা সম্পর্কে তত্ত্বও দিচ্ছি। পাশ্চাত্যের জটিল বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি যাকে সত্য বলে ধরে নেয়, তার অনেক কিছুই অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে।

কোষ জীববিজ্ঞানী কেনেথ আর মিলার ব্যাখ্যা করেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কোনো ধারণা বা অুনমানের নাম নয়। তত্ত্ব হলো এক গুচ্ছ ব্যাখ্যার নাম, যা অনেকগুলো ঘটনাকে জোড়া দেয়। এ‌‌‌টি শুধু সে ঘটনার ব্যাখ্যাই দেয় না, ভবিষ্যত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ থেকে কী পাওয়া যাবে তার পূর্বাভাসও দেয়।

তার মানে আমরা নতুন বড় ভাবনাকে একটি উপযুক্ত গাণিতিক কাঠামো দান করি। তবে একে কাজে লাগিয়ে কোনো বাস্তব কোনো কাজের কাজ করতে না পারা পর্যন্ত তর্কযোগ্যভাবে একে বৈজ্ঞানিক অনুকল্প (hypothesis) বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব নয়। যে তত্ত্ব প্রায়োগিক উপাত্তের কোনো ভিত্তি রচনা করতে পারে আর যে তত্ত্ব তা পারে না, তাদের গুরুত্ব সমান নয়।

তবে এখন বিজ্ঞানীরাও থিওরি বা তত্ত্ব শব্দটাকে অনেকটা যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেন।///// গত কয়েক দশকে নতুন প্রায়োগিক তথ্য হাতে পাওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে ওঠেছে। তা নাহলে হয়তো আকর্ষণীয় অুনমানকে আরও দৃঢ়ভাবে বাস্তব জগতে স্থান করে দেওয়া যেত।///// একটু পরেই আমরা দেখব, কিছু কিছু তাত্ত্বিক সফলতার অর্থকে নতুন করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। বিশেষ করে কাজটা করছেন সেসব তাত্ত্বিক, যারা তথাকথিত সার্বজনীন তত্ত্ব (theory of everything) সূত্রায়িত করার মতো বড় স্বপ্ন দেখেন।

এক‌‌‌টি তত্ত্ব কীভাবে গড়ে ওঠা উচিত তার ভালো একটি উদাহরণ আমারা দেখেছি ১৯৭০-এর দশকে। সেসময় একটি মহাএকীভূত তত্ত্ব (grand unified theory) তৈরির চেষ্টা চলছিল। যে তত্ত্ব সবল বলের কালার, দুর্বল বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলকে একীভূত করবে। কণাপদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ক্ষেত্র তত্ত্বগুলোকে দেখে একইরকম মনে হলেও এরা আসলে বেশ আলাদা ও সম্পর্কহীন। কোয়ার্ক ও গ্লুয়ন নিয়ে জানতে আমরা নির্ভর করি কিউসি‌‌‌ডির (QCD) ওপর। আবার কোয়ার্ক ও লেপটনের মধ্যকার দুর্বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় মিথস্ক্রিয়া নিয়ে জানতে ব্যবহার করি তড়িৎদুর্বল বলের ভগ্ন ক্ষেত্র তত্ত্ব।

ফলে মডেলের সবকিছুই কিছুটা অসন্তোষজনক। ফলে বিজ্ঞানীরা এমন একটি ক্ষেত্র তত্ত্ব খুঁজতে শুরু করলেন, যা সব ক্ষেত্র ও বলকে একই সুতো্য় গাঁথবে। ১৯৭৪ সালে মার্কিন তাত্ত্বিক শেলডন গ্ল্যাশো ও Howard Georgi ভাবলেন, তাঁরা পেয়ে গেছেন সে ক্ষেত্র তত্ত্ব। এমন একটি মহাএকীভূত তত্ত্ব প্রতিসাম্য ভেঙে গেলে যে আলাদা আলাদা তত্ত্বে পরিণত হয় সেগুলে‌‌‌ার চেয়ে তার নিজের অবশ্যই উচ্চ্তর প্রতিসাম্য থাকবে। থাকবে বেশিসংখ্যক গাণিতিক মাত্রা। ধারণা করা হয়েছিল, মহাএকীভূত তত্ত্ব প্রথমে ভেঙে গিয়ে স্ট্রং কালার ফোর্স ও তড়িৎদুর্বল বলে বিভক্ত হবে। মনে করা হয়, বিগ ব্যাংয়ের ১০-৩৫ সেকেন্ড পরে তা ঘটেছিল। এর পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে কোনো হিগস-সদৃশ ক্ষেত্রের সাথে কোনো অনির্দিষ্ট মিথস্ক্রিয়া। পরে তড়িৎদুর্বল প্রতিসাম্যও ভেঙে যায়। এটা ঘটে হিগস ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। জন্ম হয় দুর্বল বল ও তড়িচ্চুম্বকত্বের। এটা বিগ ব্যাংয়ের এক ট্রিলিয়ন সেকেন্ডের প্রায় এক ভাগ (১০-১২) সময় পরের কথা।

সেসময় মনে হচ্ছিল, কাজের বেশ অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু উচ্চতর প্রতিসাম্যের অনিবার্য পরিণতি হলো, প্রতিটি কণার এখন অন্য যে-কোনো কণার সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে একটি তড়িৎনিউক্লীয় (electronuclear) বল, যাকে বহন করে কাল্পনিক কোনো এক্স (X) বোসন। এ সম্পর্কগুলোর কোনো কোনোটি তড়িৎনিউক্লীয় প্রতিসাম্যের ভাঙনের পরেও টিকে থাকে। আর Georgi–Glashow তত্ত্বে এর অর্থ দাঁড়ালো, প্রোটনের অভ্যন্তরে থাকা কোয়ার্করা এক ধরনের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় (radioactive decay) অনুভব করবে। যার ফলে প্রোটন রূপান্তরিত হয়ে একটি প্রশম পাইওন (neutral) ও একটি পজিট্রনে পরিণত হবে। জর্জি? বলেন, ‘তখন আমি বুঝলাম, পরমাণুর মৌলিক উপাদান প্রোটন এর ফলে অস্থিতিশীল হয়ে গেল। ঐ মুহূর্তে আমি খুব হতাশ হয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।’

অুনমানমূলক তত্ত্ব থেকে ঠিক এটাই আমরা চাই। একে পূবার্ভাস দিতে হবে। জর্জির হতাশার কারণ হলো, তিনি জানতেন প্রোটন অস্থিতিশীল নয়। পরবর্তীতে এ নিয়ে অনেকগুলো পরীক্ষাও পচিালিত হয়েছে। ভূগর্ভের অনেক গভীরে স্থাপিত বিশাল আকারের ট্যাংকে অতিবিশুদ্ধ পানিতে প্রোটনের ভাঙন দেখার চেষ্টা করা হয়। পরিষ্কার দেখা গেল, প্রোটন কণা জর্জি-গ্ল্যাশোর অনুমানের চেয়ে অন্তত দশ হাজার গুণ বেশি সময় স্থায়ী হয়।\*২

অন্য পথেও হাঁটা হয়। তবে কোনো সমাধান চোখে পড়ছিল না। ১৯৮০ সালে প্র‌‌‌তিষ্ঠিত মহাএকীভূত তত্ত্ব নিয়ে একটি বার্ষিক সম্মেলন হয়। কিন্তু ১৯৮৯ সালের পর বিষয়টিতে কেউ আর মনোযোগ ধরে রাখতে পারেননি। সকল তাত্ত্বিক ব্যস্ত হয়ে ‌‌‌গেলেন অন্য কাজে। আর আসলে এটাই প্রত্যাশিত। যে তত্ত্ব এমন পূবার্ভাস দেয় যাকে একসময় ভুল প্রমাণ করা যাবে, সে তত্ত্ব একসময় পরিত্যাক্ত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ শিক্ষা নেয়। পদার্থবদরা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।#২

গ্ল্যাশো স্বীকার করেন, ‘আরও অগ্রগতির জন্য সম্ভবত আমাদেরকে মহাকর্ষকেও এতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। আইনস্টাইনও আমৃত্যু এটাই বিশ্বাস করতেন। আর তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছর তিনি প্রিন্সটনের বাগানের পথে হেঁটেছেন এ বিশ্বাস বুকে নিয়েই।’

অতএব আমাদের লক্ষ্য আরেকটি বড় ভাবনা। তাত্ত্বিকরা সম্ভবত একটু বেশিই আশাবাদী করে ফেলেছিলেন। মহাএকীভূত তত্ত্ব জিনিসটা আসলে কী তা সঠিক করে বোঝার আগেই তত্ত্বটা বানিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। এদিকে কণাপদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেল নিজেই অনেক সমস্যায় জর্জরিত। হয়তোবা সেগুলোকে ঠিকঠাক করাটাই হওয়া উচিত প্রথম কাজ। এমন একটি সমস্যার নাম ক্রমবিভক্তি সমস্যা (hierarchy problem)। এ সমস্যাটার বিশেষ গুরুত্বের কারণ, হিগস বোসনের ভর বের করতে গেলে এর দেখা মেলে।

২০১২ সালের জুলাই মাসে হিগস বোসন আবিষ্কৃত হয়। নিঃসন্দেহে এ এক বড় অর্জন। ব্যাপারটা এমন নয় যে যথেষ্ট বড় একটি পার্টিকেল কোলাইডার বানিয়ে তাতে ...generate the kinds of collision energies needed to bring it out into the open. ব্যাপারটা হলো, বানাতে হবে এমন কোলাইডার, যা অনেক বড় পরিসরের শক্তির প্রভাব অনুসন্ধান করতে পারবে। কারণ, হিগস বোসন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলেও আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত কেউ এর ভর অনুমান করতে পারেনি।

এর কারণ হলো, স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় উপায়ে হিগসের ভর বের করতে হলে কণার উন্মুক্ত ভরকে (bare mass) সংশোধন করে নিতে হয়। এর নাম বিকিরণজাত (radiative) সংশোধন। এর মাধ্যমে এর পুনর্স্বাভাবাকিকীকরণ (renormalization) হয়। এ সংশোধন করার সময় অনেকগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হয়। হিগস বোসন গতিশিীল থাকা অবস্থায় যতগুলো প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায় সবগুলো বিবেচনা করতে হয়। বিবেচনা করতে হয় অন্য কণা ও প্রতিকণা তৈরির ভার্চুয়াল প্রক্রিয়াগুলোও। যে প্রক্রিয়ায় কণারা অল্প সময়েরর জন্য তৈরি হয়ে আলাদা হয় ও পরে আবার যুক্ত হয়ে যায়। এখন, তত্ত্বটা বলে, হিগস বোসন অন্য কণার সাথে যুক্ত হয় তাদের ভরের সরাসরি সমানুপাতিক হারে। ফলে টপ কোয়ার্কের মতো ভারী কণাদের ভার্চুয়াল প্রক্রিয়া হিগস বোসনের আচ্ছাদিত ভরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

অল্প কথায় বললে ব্যাপারটা হয়, এর ওপর ভিত্তি করে হিগসের ভর বড় হয়ে চলে আসবে প্ল্যাংক স্কেলে। এখন, প্ল্যাংক ভরের মান হলো ০.০২ মিলিগ্রাম। যা একটি প্রোটনের ভরের ১ লক্ষ কোটি কোটি ভাগের প্রায় এক ভাগ। মানটা একদম ছোট নয়। খালি চোখে দেখার জন্য যথেষ্ট। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সবগুলো বিকিরণজাত সংশোধন থেকে প্রাপ্ত অংশগুলো কোনো কারণে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে হিগসের ভর এসে ঠেকেছে এর আবিষ্কৃত মানে। যা একটি প্রোটনের ১৩৩ গুণ।

এর অবশ্য মোটামুটি স্পষ্ট কিছু কারণ আছে। মার্কিন পদার্থবিদ স্টিফেন মার্টিন ২০১১ সালে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেন এভাবে, ‘হিগস ভরের এ ভয়ঙ্কর অংশগুলোর নিয়মতান্ত্রিক অপসারণ শুধু একটি ষড়যন্ত্রের মধ্যমেই করা সম্ভব। পদার্থবিদরা এ ষড়যন্ত্রকে ভালো নামে ডাকেন প্রতিসাম্য (symmetry)।

আলোচ্য প্রতিসাম্যকে বলা হয় সুপারসিমেট্রি বা অতিপ্রতিসাম্য। সুপারসিমেট্রির প্রথম তত্ত্বগুলো তৈরি হয় ১৯৭০-এর দশকে। মস্কো ও খারকভের কয়েকজন বিজ্ঞানী কাজটি করেন। ১৯৭৩ সালে সার্নের দুই বিজ্ঞানী জুলিয়াস ওয়েস ও ব্রুনো জুমিনো আলাদাভাবেও তত্ত্বটা আবিষ্কার করেন।\*৩ মাথায় রাখতে হবে, এটা কিন্তু মহাএকীভূত তত্ত্ব নয়। অতিপ্রতিসাম্যকে বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ভাবা যেতে পারে। প্রকৃতি আসলেই অতিপ্রতিসম (supersymmetric) হলে বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড মডেলের কিছু (সব নয়) সমস্যার সমাধান হবে। মহাএকীভূত তত্ত্ব পাওয়ার পথটা আরেকটু উন্মুক্ত হবে।

অতিপ্রতিসাম্যের অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বানানো তত্ত্বগুলোতে ফার্মিয়ন ও বোসনদের মধ্যে একটি মৌীলক স্থান-কাল তৈরি হয়। এ ত্ত্বগুলো অনিবার্যভাবেই বহু কণার জন্ম দেয়। এমন একটি তত্ত্ব হলো তথাকথিত মিনিমাল সুপারসিমেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড মডেল (MSSM)। কণাপদার্থবিদ্যার বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড মডেলে প্রতিসাম্যের সবচেয়ে সরল প্রয়োগ এটি। তত্ত্বটি প্রতিটি ফার্মিয়ন কণার বিপরীতে একটি অতিপ্রতিসম ফার্মিয়ন কণার পূর্বাভাস দেয় (একে ডাকা হয় এসফার্মিয়ন (sfermion) নামে, যা স্কেলার-ফার্মিয়ন শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ)। এটা আসলে একটি বোসন। ইলেকট্রনের সঙ্গীকে বলা হয় এসইলেকট্রন। প্রতিটি কোয়ার্কের বিপরীতে আছে একটি এসকোয়ার্ক।

একইভাবে বর্তমান স্ট্যান্ডার্ড মডেলের প্রতিটি বোসনের বিপরীতে আছে একটি করে অতিপ্রতিসম বোসন। নাম বোসিনো (bosino)। এটা আসলে একটি ফার্মিয়ন। ফোটন, ডাব্লিউ (W) ও জেড (Z) কণার অতিপ্রতিসম সঙ্গীর নাম যথাক্রমে ফোটিনো (photino), উইনো\*৪ (wino) ও জাইনো (zino)।

সুপাসিমেট্রিকে সঠিক ধরে নিলে ভারী ফার্মিয়ন কণার বিকিরণজাত সংশোধন ভারী এসফার্মিয়ন কণার বিকিরণজাত সংশোধন দ্বারা নাকহয়ে যায়। এখন, গণিতে আমার অভিজ্ঞতা সামান্য। কোনো বাস্তব সক্ষমতা নেই বললেই চলে। তবে আমার লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে যা বুঝতে পেরেছি তা বলছি। এক গুচ্ছ জটিল গাণিতিক সমীকরণ করতে গিয়ে যদি দেখেন বিশৃঙ্খল রাশিগুলো প্রায় কাটাকাটি চলে যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে উত্তরটা অর্থপূর্ণ। আর ফলটা হবে বিশুদ্ধ ও নির্মল আনন্দের উৎস। আর সুপাসিমেট্রি তত্ত্বগুলোতে এটাই ঘটে। চূড়ান্ত ফল হলো, হিগস বোসনের ভর নীতিগতভাবে একটি যৌক্তিক মানে এসে স্থিতিশীল হয়।

এ ধরনের ঘটনা আগেও দেখা গেছে। বস্তু ও প্রতিবস্তুর কণার (ও প্রতিকণার) অস্তিত্ব প্রকৃতির এমনই এক প্রতিসাম্যের সাক্ষ্য দেয়। তবে বস্তু ও প্রতিবস্তুর প্রতিসাম্য হলো একদম নিখুঁত (exact)। বৈদ্যুতিক আধান (electric charge) ছাড়া ইলেকট্রন ও এর ধনাত্মক সঙ্গী পজিট্রন প্রায় একইরকম আচরণ করে। ভরও একদম সমান। অতিপ্রতিসাম্যের ক্ষেত্রে এটা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ নিখুঁত প্রতিসাম্যের অর্থ হলো, আমরা আশা করব, এসইলেকট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান হবে। আর এর মানে হলো, প্রকৃতিতে এসইলেকট্রনদের উপস্থিতি সংখ্যায় অন্তত পজিট্রনের মতো হবে।\*৫ এরা বাস্তবে থেকে থাকলে এতদিনে আমরা অবশ্যই পেয়ে যেতাম।

কোনো এসকণা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ সরল কথাই বলে দেয়, প্রকৃতি অপিতপ্রতিসম হয়ে থাকলে অতিপ্রতিসাম্য অবশ্যই ভেঙে যায়। কণাদের সুপার-পার্টনারদের ভর এ পর্যন্ত নির্মিত পার্টিকেল কোলইডারগুলোর সক্ষমতার সীমার বাইরে চলে যায়।\*৬ স্বীকার করতেই হবে, এমন ঘটনার ভালো কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমাদের হাতে নেই।

লার্জ হ্যাড্রোন কোলাইডারে এ পর্যন্ত পরিচালিত পরীক্ষাগুলো সবচেয়ে সরল সুপাসিমেট্রিক তত্ত্বগুলোকেও (MSSM-এর মতো) বাতিল করে দিচ্ছে। এখন, একটিমাত্র অতিপ্রতিসাম্যের জন্যই প্রায় ১২০টি বাড়তি পরামিতি (parameter) প্রয়োজন। এদের বেশিরভাগই অতিপ্রতিসাম্যের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙনের কাজে নিয়োজিত। এমনিতেই স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ২০টির বেশি পরামিতি ঠিকঠাক করার চেষ্টা চলছে। সেখানে ১২০ তো অনেক বেশি। আরও বেশি অতিপ্রতিসাম্য তত্ত্বের সমস্যা আরও বেশি। পরামিতির সমস্যা তো আছেই। পাশাপাশি দেখা যায়, অতিপ্রাতিসাম্যকে যেভাবে ভাঙলে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের আমাদের জানা কনাগুলো পাওয়া যাবে, সেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাঙাটা বাস্তবে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, অতিপ্রতিসাম্যের অনুমান (assumption) বিকিরণজাত সংশোধনের ঝামেলা থেকে মুক্তি দেয়। তবে একে এখন আর ক্রমবিভক্তি সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান মনে করা হয় না। আর এটি বাস্তব অর্থে পরীক্ষাযোগ্য কোনো পূবার্ভাস তৈরিরও কোনো ভিত্তি রচনা করে না।

অতিপ্রতিসাম্যের বড় ভাবনাটির (big idea) মূল অংশ সুপার-পার্টনার কণারা– এমন ভাবলে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। হ্যাঁ, এস-কণারা এক অনিবার্য পরিণতি। তবে সত্যিকার বড় ভাবনাটি হলো ফার্মিয়ন ও বোসনদের মধ্যকার মৌলিক স্থান-কাল প্রতিসাম্য। সত্যি বলতে, অতিপ্রতিসাম্য কোনো তত্ত্ব নয়, এটি হলো এক গুচ্ছ তত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য।

আর এতেই আছে একটি ইঙ্গিত। সার্বিক আপেক্ষিকতার স্থান-কালকে অতিপ্রতিসম ধরে নিলে আমরা পাই সুপারগ্র্যাভিটি তত্ত্ব। এর প্রাথমিক উদাহরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রস্তুত হয় ১৯৭৬ সালে। এতে কাজ করেন মার্কিন বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ফ্রিডম্যান, ডাচ পদার্থবিদ পিটার ভ্যান নিউয়াহুইজেন ও ইতালিয় সেরজো ফেরারা। আবার স্বতন্ত্রভাবে কাজটি করেন স্ট্যানলি স্ট্যানলি ডিসার ও ব্রুনো জুমিনো। এ তাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেন, অতিপ্রতিসাম্যকে মেনে নিলে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির পুনর্স্বাভাবিকীকরণ বিষয়ক কিছু সমস্যা থেকে কিছুটা (পুরোপুরি নয়) মুক্তি মেলে। এর আগে ফাইনম্যান ও অন্যরা গ্র্যাভিটন কণার বিকিরণজাত সংশোধনে আসা অসীম মান নিয়ে ঝামেলায় ছিলেন। এখন দেখেে মনে হলো, গ্র্যাভিটনের সুপার-পার্টনার গ্র্যাভিটিনো সে মানকে আংশিক বাতিল করে দেয়।

সুপারগ্র্যাভিটির পরিবর্ধিত একটি সংস্করণ নিয়ে সবাই আগ্রহী হয়ে উঠল। এ তত্ত্বের ভিত্তি আটটি আলাদা ধরনের অতিপ্রতিসাম্য। এ তত্ত্ব গ্র্যাভিটনকে তো স্বীকার করেই, পাশাপাশি আরও আটটি গ্র্যাভিটিনো এবং ১৫৪টি অন্য কণার কথা বলে (যা দেখে মনে হয়, কোয়ার্ক ও গ্লুয়ন হয়তোবা মৌলিক কণাই নয়)। কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছিল, পাওয়া গেছে ‘আসল জিনিস’। ১৯৮০ সালে স্টিফেন হকিং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি তখন প্রতিষ্ঠানটিতে পদার্থবিদ্যার লুকাসিয়ান প্রফেসর (একসময় নিউটন এ পদে আসীন ছিলেন)। তিনি এতে প্রশ্ন তোলেন, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার ইতি হতে চলল কি না। তখনও সুপারগ্র্যাভিটি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা চলছিল। তবে হকিং দাবি করেন, চোখের সামনে এটাই একমাত্র পথ।

প্রথমদৃষ্টিতে অতিপ্রতিসাম্যকে বেশ প্রতিশ্রুতিশীল মনে হয়েছিল। তবে এটি পুনর্স্বাভাবিকীকরণের সমস্যা পুরোপুরি দূর করতে পারেনি।

আটটি অতিপ্রতিসাম্যের ভিত্তিতে সুপারগ্র্যাভিটির পুনর্স্বাভাবিকীকরণযোগ্যতা এখনও বাতিলও হয়নি, আবার স্বীকৃতিও পায়নি। তবে ১৯৮০-এর দশকে সমস্যাটি থেকে উত্তরণের কোনো পথ পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে তত্ত্বটির প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে যেতে শুরু করে।\*৭

এরপর দৃশ্যপটে আসেন তরুণ তাত্ত্বিক অমিতাভ সেন। বলছি ১৯৮২ সালের কথা। তাঁর কর্মস্থল তখন মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স। সেখানে কাজ করছিলেন পোস্টডক্টরাল সহযোগী হিসেবে। তাঁর প্রকাশিত দুটো গবেষণাপত্র (paper) তাত্ত্বিকদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। নড়েচড়ে বসেন তাঁরা।\*৮

সেনের কাজটি বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু অন্য দিক থেকে ঘুরে আসতে হবে।

পদার্থবিদ্যার প্রায় সব জায়গায় ভেক্টর ব্যাপক গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে। এগুলো এক ধরনের ভৌত বৈশিষ্ট্য, যার থাকে নির্দিষ্ট মান (magnitude) (বড়, মাঝামাঝি ও ছোট) ও দিক (direction) (এই দিকে বা ওই দিকে)। পদার্থবিদ্যায় ভেক্টর রাশির অন্যতম সরল উদাহরণ হলো রৈখিক ভরবেগ (linear momentum)। চিরায়ত গতিবিদ্যায় (classical mechanics) একটি বস্তুর রৈখিক ভরবেগ পাওয়া যায় এর ভরকে বেগ দিয়ে গুণ দিয়ে। বস্তুর গতির দিকই হলো এ রাশির দিক। এখান থেকে ওখানে। ভেক্টর রাশিকে সাধারণত তিরচিহ্ন এঁকে প্রকাশ করা হয়। বস্তুটি থেকে এর গতির দিক বরাবর তির আটি আঁকা হয়। দৈর্ঘ্য নির্ভর করে রাশির মানের ওপর। রৈখিক ভরবেগ বেশি হলে তির আঁকা হয় বড় করে।

ভেক্টর রাশিকে প্রকাশ করতে মান ও দিক দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। পেশাদার কোনো টেনিস প্লেয়ারকে সার্ভ করতে বললেই এর প্রয়েঅগ দেখবেন।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যায় তো এর তাৎপর্য আরও বেশি। চতুর্থ অধ্যায়ে ইলেকট্রনের স্পিনের কথা বলেছিলাম। কোনো চৌম্বকক্ষেত্রে ইলেকট্রনের স্পিন দুটি (এবং কেবল দুটি) আলাদা দিকে হতে পারে। এদেরকে আমরা বলি স্পিন-আপ ও স্পিন ডাউন। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য ইলেকট্রনের অভ্যন্তরীণ স্পিন কৌণিক (angular) ভরবেগ দায়ী। স্পিনকে আমরা ভেক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি, যা দুটি আলাদা দিকে মুখ করে থাকতে পারে (যার প্রতিটির মান হয় h/4π, যেখানে h হলো প্ল্যাংক ধ্রুবক।)

ভেক্টর অবশ্য স্কেলার রাশির (যাতে শুধু মান থাকে) চেয়ে কিছুটা জটিল। তবুও সমতল ইউক্লীডিয় স্থানে ভেক্টরের গতিবিদ্যা বিশ্লেষণ করতে আমাদের কোনো অসুবিধাই হয় না। নির্দিষ্ট মান ও দিকের (ধরুন এটির দিক ওপরের দিকে) একটি ভেক্টরকে কোনো ভৌত বল দ্বারা কোনো স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। x1y1z1 স্থানাঙ্কের অবস্থান থেকে x2y2z2 স্থানাঙ্কের অবস্থানে সরিয়ে দেওয়া যাবে। কাজটা করা যাবে তার মান বা দিক পরিবর্তন না করেই। তাও সবকিছু কাজ করবে ঠিকঠাক। তবে বক্র স্থানে যাওয়া মাত্রই শুরু হবে সমস্যা।

এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে তৃতীয় শতকের চীনা একটি উদ্ভাবন সম্পর্কে জানলে সুবিধা হবে। এর নাম দক্ষিণমুখী রথ (chariot)। এটি দুই চাকার একটি রথ। কাঠের খোদাই করা একটি মূর্তি এক দিকে একটি হাত বাড়িয়ে রেখেছে। যাত্রার শুরুতে মূর্তির হাতকে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে রাখা হয়। এতে ব্যবহার করা হয় দারুণ এক গিয়ার কৌশল। এতে করে রথ যতই মোচড় বা মোড় নিক, মূর্তি দক্ষিণ দিকেই মুখ করে থাকবে (চৌম্বক কম্পাস আবিষ্কারের বহু আগের কথা এটি)।

ধরুন মূর্তিটা একটি ভেক্টর। আমাদের যাত্রা শুরু হলো উত্তর মেরুেতে। ফলে এখ্ন থেকে যে-কোনো দিক হবে দক্ষিণ (চিত্র ১৫)। মূর্তিটাকে একটি নির্দিষ্ট দিকে মুখ করিয়ে আমরা বিষুবরেখা বরাবর চলতে শুরু করলাম (কাজটা বাস্তবে কীভাবে হবে সে চিন্তা আপাতত বাদ দিলাম)। ভূপৃষ্ঠের ওপরে ভেক্টরটা চলল সরল পথে। আসলে আমরা জানি, এটা আসলে একটা জিওডেসিক (geodesic)। বিষুবরেখায় পৌঁছে আমরা রথটাকে পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। তবে গিয়ার কৌশলের মাধ্যমে মূর্তিটাকে দক্ষিণমুখীই রাখা হলো। বিষুবরেখা বরাবর আমরা চললাম ১০,০০০ ///মাইল?কি.মি./////। যা পৃথিবীর পরিধির চার ভাগের এক ভাগ। এরপর আমরা উত্তরে ঘুরলাম। আমরা উত্তর মের‌রুর দিকে যাওয়ার সময়ও মূর্তি দক্ষিণমুখী আছে।

চিত্র ১৫: দক্ষিণমুখী রথ (চিত্রের ওপরের অংশে) উত্তর মেরু থেকে বিষুবরেখার (চিত্রের নীচের অংশে) দিকে যাত্রা শুরু করে। বিষুবরেখায় পৌঁছে এটি পূর্ব দিকে চলে ১০,০০০ /////মাইল?কি.মি./////। এরপর আবার উত্তর দিকে ঘোরে। উত্তর মরেুতে পৌঁছার পর দেখা যায়, এর শুরুর ও চূড়ান্ত দিক সমকোণে (৯০ ডিগ্রি কোণ) আছে। এটাই ভেক্টর রাশির সমান্তরাল পরিবহন।

আমরা রথটিকে এর আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনি। তবে এখন মূর্তির দিক পাল্টে গেছে। এর আগের দিকের সাথে বর্তমান দিক সমকোণে (৯০ ডিগ্রি কোণ) অবস্থান নিয়েছে। আমরা ভেক্টরের দিক পরিবর্তন করতে কোনো কিছুই করিনি। কিন্তু গোলকের পৃষ্ঠের চারপাশে সমান্তরাল পরিবহনের মতো সরল প্রক্রিয়া পাল্টে দিয়েছে এর দিক।

এখন, পদার্থবিদ্যার যে-কোনো তত্ত্বে ভেক্টরের দিক খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসি। সাবির্ক আপেক্ষিকতা বক্র স্থানে বানানো এক তত্ত্ব। এমন যে-কোনো সমান্তরাল পরিবহনের প্রভাবগুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের প্রভাবগুলোকে যেন নির্দিষ্ট কোনো স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল না হয় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। এটাই সাধারণ সহভেদ নীতির (general covariance) দাবি। আইনস্টাইন এ ব্যাপারটা ভালোভাবেই জানতেন।

এর একটি সমাধান দেন ইতালিয় গণিতবিদ টুলিয়ো লেভি চিভিটা। এ‌‌‌টি আবার স্থানের বক্রতার ওপরই নির্ভরশীল।\*৯ আমাদের দক্ষিণমুখী রথের উদাহরণে রথের বদলে কল্পনা করুন আমরা পৃথিবীকেই ঘোরাতে পারছি। এক্ষেত্রেও রথ পৃষ্ঠের ওপরে একই জিওডেসিক ধরে চলে। সমান্তরাল পরিবহনের এ পদ্ধতিকে বলে গোলকের ওপরস্থ লেভি-সিভিটা কানেকশন। এখন আর গোলকীয় পৃথিবীর পৃষ্ঠে ভেক্টরের পরিবহন তুলে ধরতে আমাদেরকে সম্ভাব্য জটিল এক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা (x, y, z) ব্যবহার করতে হবে না। এর বদলে বরং আমরা গোলকের জ্যামিতি (এবং বিশেষ করে প্রতিসাম্য) দিয়েই সব কাজ করিয়ে নিতে পারব। ফলে এ কানেকশন পৃষ্ঠের ওপরে সুসঙ্গত উপায়ে পরিবহনের স্বাভাবিক কৌশল দেখিয়ে দেয়। অস্বাভাবিক কোনো স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয় না।

কানেকশনের ধারণাকে একটু অপিরচিত মনে হতে পারে। তবে কণাপদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেলের তত্ত্ব কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিগুলোকে কিন্তু কানেকশন থিওরিও মনে করা যেতে পারে।\*১০ এ উদাহরণগুলোতে ভেক্টরকে (যেমন স্পিনযুক্ত ইলেকট্রন) সামন্তরালভাবে পরবিহন করায় কোয়ান্টাম ফিল্ড-ই। আর ফিল্ড বক্র হলে–মানে ফিল্ডের এক অংশ থেকে অন্য অংশে এর শক্তি মান ও দিক পরিবর্তন করলে–বদ্ধ লুপের চারপাশে গতিশীল ভেক্টর এর যাত্রা শুরুর স্থানে ফিরে আসলে দিক পরিবর্তন করতে পারে। ঠিক যেভাবে উত্তর মেরুতে ফিরে এসে রথের মূর্তির দিক বদলে গেছে। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে আমরা ফিল্ডকে সমতল, ইউক্লিডীয় স্থানের পটভূমিতে আটকে দেই। যার ফলে আমরা বলতে পারি, ভেক্টরটা এখান থেকে ওখানে গেছে এবং আবার ফিরে এসেছে এখানে।

এর এখানেই আছে বড় সেই ভাবনাটি। সাবির্ক আপেক্ষিকতাকে কানেকশন থিওরি হিসেবে নতুন করে সূত্রায়িত করা গেলে সম্ভবত এ‌‌‌টি চিরায়ত (classical) ফিল্ড থিওরির মতো আচরণ করতে শুরু করবে। যাকে তখন করা যাবে কোয়ান্টায়িত। যেভাবে ম্যাক্সওয়েলের চিরায়ত তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রকে (electromagnetic field) কোয়ান্টায়িত করে কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যা (QED) বানানো হয়েছিল। তবে দুটোর মধ্যে বড় এক পার্থক্য আছে। সাবির্ক আপেক্ষিকতার কানেকশন থিওরির সূত্রায়নে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র হলো কানেকশনের সিস্টেম। কিন্তু এখন আর একে পছন্দসই কোনো স্থান-কালের পটভূমিতে আটকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্থান-কালের মেট্রিক কানেকশনের সিস্টেম থেকে নিজে নিজেই উদয় হয়।

এ উপলব্ধির আছে বিশাল এক ইতিহাস। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে আইনস্টাইন (এবং শ্রোডিঙ্গারসহ একই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করা অন্যরা) সাবির্ক আপেক্ষিকতা ও তড়িচ্চুম্বকত্বকে একীভূত করার চেষ্টা করেন। তাঁরা লেভি-সিভিটা কানেকশনের সিস্টেমকে প্রাথমিক চলক হিসেবে ব্যবহার করে সাবির্ক আপেক্ষিকতাকে নতুন করে সূত্রায়িত করে কাজটি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাজটি ছিল দুরূহ। আইনস্টাইন সন্দেহের সাগরে ডুবে গেলেন। এক পর্যায়ে তিনি শ্রোডিঙ্গারকে বলেন, ‘আমরা এর পেছনে বহু সময় অযথা নষ্ট করেছি। আর তার ফল দেখে মনে হচ্ছে, এটা শয়তানের নানীর পক্ষ থেকে পাঠানো এক উপহার।’ সাবির্ক আপেক্ষিকতাকে নতুনভাবে সূত্রায়িত করার এসব প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলো গণিতের মারপ্যাঁচে থমকে যায়। শেষ পর্যন্ত লাভের খাতা শূন্য।

এখন সাবির্ক আপেক্ষিকতাকে কানেকশনের সিস্টেম দিয়ে সূত্রায়ন করলে এ‌‌‌টি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইচ্ছাই যেখানে ছিল এম তত্ত্ব বানানো, যেখান থেকে স্থান-কাল নিজেই বেরিয়ে আসবে, সেখানে তত্ত্বটাকে সহজেই বোঝা যাবে– এমন আশা করাই ভুল। দুঃখিত।

১৯৭০-এর দশক পেরোবার আগেই একই রকম আরেকটি যুক্তর প্রয়োগ চোখে পড়ে। এ যুক্তি খাটানো হয় স্পিন কৌণিক ভরবেগধারী সমান্তরাল পরিবহনের ক্ষেত্রে। এ থেকে পাওয়া যায় স্পিন কানেকশন নামে কানেকশনের সিস্টেম। কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞানে (solid state physics) এর ফলপ্রসূ কিছু প্রয়োগও পাওয়া যায়। স্পিন কানেকশনের ধারণা নতুন নয়। ১৯৩০-এর দশকে এর জন্ম। সেন এ ধারণা কজেি লাগিয়ে সার্বিক আপেক্ষিকতার এডিএম হ্যামিল্টোনিয়ান#৩ রূপ নতুক করে সূত্রায়ন করেন। স্থান-কালের মেট্রিকের বদলে ব্যবহার করলেন স্পিন কানেকশন। এখান থেকেই চেনাজানা বক্র স্থান-কাল বের করে আনা যায়। সবকিছুই ছিল আশাব্যাঞ্জক। গ্র্যাভিটনের প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যধারী বস্তুরও ইঙ্গিত মেলে এখান থেকে।

তবে এ ভাবনা ছিল বড্ড অপরিপক্ব। চার্লস মিসনারসহ বেশ কিছু তাত্ত্বিক তাঁকে সহায়তা করেন। এছাড়াও ভারতে জন্ম নেওয়া তাত্ত্বিক অভয় অষ্টকার সুপরামর্শ ও উৎসাহ দেন। সেন পিএইচডি করেছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। অষ্টকার তখন সেখানে পেস্টডক করছিলেন। বেশকিছু গবেষণাপত্রে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেন। অষ্টকার তখন নিজ প্রজন্মের সার্বিক আপেক্ষিকতার অন্যতম বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার পথে। \*১১ তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে অষ্টকারের বিয়ের সময় সেন মিতবরের (best man) ভূমিকা পালন করেন। এখনও তাঁরা ভালো বন্ধু।

অষ্টকার বুঝতে পেরেছিলেন, সেনের ভাবনা কাজে লাগিয়ে সার্বিক আপেক্ষিকতার হ্যামিল্টোনিয়ানকে পুরোপুরি নতুনভাবে সূত্রায়িত করা যাবে। সেন পদার্থবিদ্যা ছেড়ে টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত জয়েন করেন মটোরোলায়। পরের দুই বছর কাজ করে অষ্টকার সেনের ভাবনাকে বিস্তৃত করেন। বের করেন আনেন তত্ত্বের ফলাফল। আবিষ্কার করেন চমকপ্রদ একটি জিনিস। স্পিন কানেকশন সমীকরণকে শুধু দারুণভাবে সরলই করে তোলে না, এরা কাজও করে চিরায়ত ফিল্ড থিওরির মতো। হতে পারে, এ মিল ছিল দৈব কোনো ঘটনা।

তবে এটা ক্ষণস্থায়ী কোনো মিল নয়। এখন দেখা গেল, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি থেকে কিছু শক্তিশালী গাণিতিক কৌশল মহাকর্ষের কাজে লাগানো যাচ্ছে। এর ফলে সার্বিক আপেক্ষিকতা ও মৌলিক কণার তত্ত্বের মধ্যকার দেয়াল দূর হলো। তবে আপেক্ষিকতার নির্যাস যে জ্যামিতি, তার গুরুত্বও বজায় থাকল।

লি স্মোলিন ১৯৭৯ সালে হার্ভাড থেকে পিএইচডি শেষ করেন। পরের কয়েক বছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পোস্টডক্টরাল গবেষণা করে সময় কাটান। এর মধ্যে আছে প্রিন্সটনের ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি*,* সান্তা বারবারার ইন্সটিটিউট ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। সিডনি কোলম্যানের কথাই যেন সত্যি হচ্ছিল। কাজের তেমন কোনো অগ্রগতি হচ্ছিল না। ক্যারিয়ার চলছে দেখে নিজেও অবাক। তিনি বলেন, “একটি নিশ্চিত কারণ ছিল, তখন পর্যন্ত অল্প কিছু মানুষই কোয়ান্টাম মহাকর্ষ নিয়ে কাজ করেছিলেন। এ কারণে প্রতিযোগিতাও কম ছিল।" অন্তত সহকর্মীরা তখনও তাঁর কাজের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলেই মনে হলো।

১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে কানেকটিকাটের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকে পদে নিয়োগ পান। কয়েক বছর আ‌‌‌গর সেনের গবেষণাপত্র প্রথমবার প্রকাশ হওয়ার পরপরই তিনি তা পড়েছিলেন। তবে সেনের কাজকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরুতে সফল হয়নি। অষ্টকারকে চিনতেন ১৯৮০ সাল থেকে। তারপর থেকেই নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ১৯৮৫ সালে একটি ফোনকলের সময় স্মোলিন অষ্টকারের স্পিন কানেকশন বিষয়ক কাজের কথা জানতে পারেন। বুঝতে পারলেন, কোয়ান্টাম মহাকর্ষকে বাস্তব আলোচনায় নিয়ে আসতে ঠিক এই জিনিসটিই তো দরকার। এর মাধ্যমে করা যাবে হিসাব-নিকাশ। পাওয়া যাবে প্ল্যাংক স্কেলের স্থান-কাল সম্পর্কে পূর্বাভাস।

অষ্টকারকে ইয়েলে একটি সেমিনারে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেন।

**টীকা (লেখক)**

\*১। এক ধরনের মত হলো, প্রতিসাম্য ভাঙনের জন্য দায়ী স্ফীতি ক্ষেত্র (inflaton field)। আর এর মাধ্যমেই শুরু মহাজাগতিক স্ফীতির।

\*২। ইতালিয় পদার্থবিদ কার্লো রুবিয়া একে এভাবে ব্যাখ্যা করেন: ‘অর্ধ ডজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীকে দুই মাইল মাটির নীচে পাঠিয়ে পাঁচ বছর ধরে বিশাল একটি পানির আধার দেখতে বলুন।’ (পিটার ওইট, নট ইভেন রং, লন্ডন:ভিনটেজ, ২০০৭, পৃ. ১০৪)

\*৩। সাধারণত যা হয় আর কি, ইতিহাসটা আসলে আরেকটু জটিল। তত্ত্বটার মৌলিক নীতিমালা অনেক তাত্ত্বিক আবষ্কিার ও পুনরাবিষ্কার করতে থাকেন।

\*৪। জটিলতা এড়াতেই সম্ভবত উচ্চারণটা এভাবে করা হয়।

\*৫। আরেকটি বিষয় হলো, অতিপ্রতিসাম্য নিখুঁত হলে সব বস্তুকণা হবে অস্থিতিশীল।

\*৬। সার্নের লার্জ হ্যাড্রোন কোলাইডারের সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রকল্প অ্যাটলাসের (ATLAS) সাম্প্রতিক (মার্চ, ২০১৭) ফল বলছে, গ্লুয়ন কণার কাল্পনিক অতিপ্রতিসম সঙ্গী গ্লুইনো কণা বাস্তবে থেকে থাকলে তার ভর হবে প্রোটনের ভরের ২,০০০ গুণেরও অনেকটা বেশি।

\*৭। বিকিরণজাত সংশোধন বের করতে গেলে লুপ নিয়ে কাজ করতে হয়। এগুলোতে ছিল নানান ধরনের জটিলতা। দেখা গেল, এক ও দুই লুপের সরল সংশোধনের জন্য সুপারগ্র্যাভিটি পুনর্স্বাভাবিকীকরণযোগ্য। তবে উচ্চতর ক্রমের সংশোধনের জন্য পুনর্স্বাভাবিকীকরণ সম্ভব হয়নি।

\*৮। ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালেও সেনের দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ পেয়েছিল। তখন তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েরর ছাত্র।

\*৯। লেভি চিভিটা ছিলেন গ্রেগোরিও রিটচি কুরবাস্ট্রোর ছাত্র। ‌‌‌তিনি টেনসর ক্যালকুলাস উদ্ভাবন করেছিলেন। আইনস্টাইন সেটা কাজে লাগিয়েই সার্বিক আপেক্ষিকতার সূত্রগুলো প্রস্তুত করেন। তত্ত্বটির গাণিতিক গঠন সম্পর্কে ১৯১৫-১৭ সময়কালের মধ্যে আইনস্টাইন ও লেভি চিভিটা অনেকবার যোগাযোগ করেন। ১৯২১ সালে প্রকাশিত আইনস্টাইনের*রিলেটিভিটি: দ্য স্পেশাল অ্যান্ড জেনারেল রিলেটিভিটি* বইয়ের ইতালিয় অনুবাদের একটি ভূমিকা লেখেন তিনি।

\*১০। সত্যি বলতে, ১৯১৮ সালে জার্মান গণিতবিদ হেরমান ভাইল একটি কানেকশন থিওরি অনুসন্ধান করছিলেন। সেটা করতে গিয়েই তিনি পরবর্তীতে প্রস্তুত গেজ থিওরির ভিত্তি আবিষ্কার করেন। গেজ থিওরি একটি বিশেষ ধরনের ফিল্ড থিওরি। সাধারণভাবে সব আধুনিক ফিল্ড থিওরির ভিত্তি এটাই।

\*১১। মার্কিন ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর বরণ অনুষ্ঠানে অষ্টকারের পরিচিতিতে লেখা হয়, “অষ্টকার সার্বিক আপেক্ষিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এছাড়া সার্বিক আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাকে জোড়া দিতে লুপ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি তত্ত্ব বানিয়েছেন।

**টীকা (অুনবাদক)**

১। কনটিনজেন্ট বলা হয় এমন বিষয়কে, যেটি বাস্তব ঘটনার আলোকে সত্য বলে গৃহীত, তবে যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা (logical necessity) তাকে স্বীকার করে না।

২। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আরও জানতে পড়ুন: ব্রিফার

#৩। এডিএম শব্দ-সংক্ষেপ এসেছে তিন বিজ্ঞানী আর্নোউইট, ডিসার ও মিসনারের নাম থেকে। আর হ্যামিল্টোনিয়ান শব্দ দিয়ে একটি সিস্টেমের মোট শক্তির পরিমাণ বোঝানো হয়। এর মধ্যে সিস্টেমের গতিশক্তি ও বিভব (সুপ্ত) শক্তি অবশ্যই অর্ন্তভূক্ত থাকে।